Prantik Gabeshana Patrika ISSN 2583-6706 (Online)
Multidisciplinary-Multilingual- Peer Reviewed-Bi-Annual
Digital Research Journal
Website : santiniketansahityapath.org.in
Volume-4 Issue-2 January 2026

স্বাধীনতা আন্দোলনে বীরভূম

সৌরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

Link : https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2026/01/5_Sourendranath-Chattopadhyaya.pdf

সারসংক্ষেপ: স্বাধীনতা লাভের পশ্চাদে দেশের জনগণের সংগ্রাম, আত্মবলিদান থাকে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ অগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। জেলায় জেলার মানুষের অবদান ব্যতিত এই স্বাধীনতা লাভ সম্ভব ছিল না। বর্তমান আলোচনায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আন্দোলনে বীরভূম জেলার অনামী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্বধীনতার লড়াইয়ে কাহিনি বিশ্লেষিত হয়েছে।

সূচক শব্দ: আদিবাসী বিদ্রোহ, বীরভূম জেলা, স্বদেশি আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন।

১

আদিবাসী বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৬): প্রকৃতির কোলে ছোট্ট একটা কুড়ে ঘর, সামান্য পরিধেয় বস্ত্র এবং সাধারণ জীবন-যাপনে আদিবাসীরা সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু জোতদার, মহাজন আর কোম্পানির পদলেহনকারী একশ্রেণির দালালদের অবজ্ঞা, বঞ্চনা আর সীমাহীন অত্যাচারের ফলে আদিবাসীরা বাধ্য হয়েছিল বিদ্রোহ করতে। তির, ধনুক, কুঠার, টাঙ্গি নিয়ে অর্ধ-উলঙ্গ আদিবাসীরা আর অপরদিকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত ব্রিটিশ বাহিনী। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ 'আদিবাসী বিদ্রোহ' নামে খ্যাত। এই বিদ্রোহ দমনের নামে প্রকাশ্য স্থানে শয়ে শয়ে ফাঁসি, নির্মম হত্যা, গ্রামের পর গ্রাম অগ্নিদগ্ধ ও লুণ্ঠন করে স্তব্ধ করে দিয়েছিল জনজীবন। কয়েকশো বছরের প্রাচীন পাঠান রাজবংশের স্মৃতি আঁকড়ে কোনোরকমে টিকে রয়েছে রাজনগর, বীরভূমের ভগ্ন রাজপ্রাসাদ। এই ভগ্ন প্রাসাদের মতো রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে আদিবাসী বিদ্রোহের ঐতিহাসিক সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে জীবন্ত 'গাবগাছ', রাজবাড়ির অদূরে। এই গাবগাছেই আদিবাসী বিদ্রোহের অন্যতম নেতা মঙ্গালা মাঝি-সহ উনিশ জনকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। নিঝুম দুপুর বা গভীর রাত্রিতে এখনো শুনতে পাওয়া যায় বুকফাটা কান্নার আর্তনাদ, স্থানীয়রা জানান। বিদ্রোহ দমন করতে শুধু এখানেই নয় সিউড়ির দক্ষিণে বিশাল কেন্দুয়া ডাঙ্গায়, সিউড়ি-সাঁইথিয়া সড়কের উত্তর পাড়ে, ফাঁসি ডাঙ্গাতেও দেওয়া হয়েছিল অনেকের ফাঁসি। কারণ ওটাই ছিল ফাঁসির স্থায়ী জায়গা। নির্মম হত্যাকাণ্ড, গ্রামের পর গ্রাম অগ্নিদগ্ধ ও বিদ্রোহ দমনে হাতি, অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিল তৎকালীন নবাব, রাজা, জমিদার, মহন্ত প্রভৃতিরা। সবাইকে টেক্কা দিলেন বীরভূমের বৃহত্তম জমিদার 'বিপ্রচরণ চক্রবর্তী।' আতঙ্ক, সন্ত্রাস আর ভয়াবহ পরিস্থিতির ফলে দীর্ঘদিন পর্যন্ত এখানে কোনো আন্দোলন বা বিদ্রোহ দানা বাঁধেনি।

২

কংগ্রেসী আন্দোলন: ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পরও গড়ে ওঠেনি কোনো আন্দোলন। কিন্তু লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গ করলে অন্যান্য জেলার মতো ক্ষোভে ফুঁসে ওঠে বীরভূম। বিভিন্ন শহর, জনপদ প্লাবিত করে বঙ্গভঙ্গের সেই ঢেউ এসে পৌঁছাল বীরভূমে। নরমপন্থী নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বীরভূমে আসেন, দুবরাজপুর-সহ আরো বিভিন্ন স্থানে সভা করেন। জেলায় বিভিন্ন স্থানে রাখিবন্ধন উৎসব ও অরন্ধন দিবস পালিত হয়। সেই সময় স্বদেশি আন্দোলনে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের অন্যতম হলেন, নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিনারায়ণ মিশ্র, গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী, বগলানন্দ মুখোপাধ্যায়, মৌলবি আব্দুল আজিজ, দামোদরচন্দ্র ব্রজবাসী প্রমুখ। দামোদরচন্দ্র ব্রজবাসীর কথা বিশেষভাবে বলতেই হয়। ভক্তকবি জয়দেবের জন্মস্থান

ও তাঁর অমর সৃষ্টি 'গীতগোবিন্দ'র জন্য কেন্দুলি খ্যাত (বীরভূম)। জয়দেব অন্তে কেন্দুলিতে মহন্তরা রাধাকৃষ্ণ সেবা করতেন। কিন্তু এখানকার অষ্টম মহন্ত দামোদরচন্দ্র ব্রজবাসী রাধাকৃষ্ণ সেবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে দেশমায়ের সেবায় উৎসর্গ করেন। এবং কংগ্রেসের জেলা কমিটির সদস্য মনোনীত হওয়ার পর, বীরভূমে স্বদেশি আন্দোলনকে এক উচ্চস্থানে পৌঁছে দিয়েছিলেন। বর্ধমানের মহারাজা আখড়ার মহন্তদের (কেন্দুলি) দান করেছিলেন কয়েকটি হাতি। দামোদরচন্দ্র সেই হাতিতে চড়ে স্বদেশি সংগীত গাইতে গাইতে এলাকা পরিদর্শন করতেন এবং বক্তৃতার মাধ্যমে এলাকায় জনজোয়ার বইয়ে দিতেন। ধর্মীয় চেতনাকে আঘাত, তাঁর বক্তৃতার বিভিন্ন অংশ জুড়ে থাকতো। তিনি বলতেন, বিদেশি কাপড়ে (মাড়ে) গরু-শূকরের চর্বি, বিদেশি চিনি গো-শূকরের রক্তে পরিস্কৃত, বিলেতি লবণে জন্তুর হাড় মিশ্রণ প্রভৃতি। তিনি তাঁর এই আন্দোলনকে শুধু বীরভূমেই নয় পৌঁছে দিয়েছিলেন সুদূর কলকাতায়। মহালয়ার পুণ্যলগ্নে গঙ্গাজলে বা জলাশয়ে দাঁড়িয়ে পিতৃ-তর্পণ হিন্দুদের অন্যতম প্রথা। তিনি কলকাতার বিভিন্ন ঘাটে উপস্থিত হয়ে (নিমতলা ঘাট, বলরামবসু ঘাট, কালীঘাট) তর্পণরত ব্যক্তিদের স্বদেশি দ্রব্য গ্রহণের জন্য শপথ পাঠ করাতেন। তাঁর নেতৃত্বে এই আন্দোলন চরম আকার ধারণ করলে, তাঁকে প্রজা বিরোধী আখ্যা দিয়ে প্রকাশ্য দিনেরবেলায় অজয়ের বালুচড়ে হত্যা করা হয়।

বীরভূমে স্বদেশি আন্দোলনের সময় বিভিন্ন স্থানে গুপ্ত বিপ্লবী সমিতিগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে বিপ্লবীদের প্রচেষ্টায় কলকাতায় লুণ্ঠিত রডা কোং কয়েকটি পিস্তল ও বেশ কিছু কার্তুজ এসে পৌঁছায় ঝাউপাড়ায় (নলহাটি, বীরভূম) ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে গ্রাম্যবধূ দুকড়িবালা দেবীর গৃহে তাঁর বোনপো নিবারণ ঘটকের মাধ্যমে। তিনি সকলের কাছে মাসিমা বলে পরিচিত ছিলেন। পরে পুলিশ অস্ত্রের কথা জানতে পেরে, সেগুলি উদ্ধার করে ও তাঁকে গ্রেফতার করে। বিচারে দুইবছর কারাদণ্ড হয়। উল্লেখ্য দুকড়িবালা দেবীই অস্ত্র আইনে গ্রেফতার প্রথম বাঙালি মহিলা।

৩

অসহযোগ আন্দোলন: ইতিমধ্যে গান্ধীজী আসছেন (বীরভূম) শান্তিনিকেতনে। এখানেই তাঁর স্বরাজ ভাবনার বাস্তব প্রয়োগ ঘটে। তাঁর স্মরণে এখনো প্রতিবছর ১০ মার্চ এখানকার ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষকরা মিলে পালন করে গান্ধীপুণ্যাহ। গান্ধীজীর কংগ্রেসে যোগদান এবং অহিংস অসহযোগ (১৯২০) আন্দোলন অন্যান্য স্থানে বিপুল সাড়া ফেললেও বীরভূমে তেমন উদ্দীপনা দেখা যায় না। উপরন্তু কংগ্রেস নেতা জিতেন্দ্রলাল ব্যানার্জী এর বিরোধিতা করে বক্তব্য রাখেন। হেতমপুর কলেজ ও সিউড়ির ছাত্ররা দলবদ্ধভাবে প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করে। বীরভূমে অসহযোগ আন্দোলনকে সক্রিয় করতে আসেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে। তিনি সাঁইথিয়া স্টেশনে পৌঁছালে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকরা তাঁর গাড়ির ঘোড়াগুলি খুলে দিয়ে, তাঁকে নিজেরাই টেনে নিয়ে যায় সরস্বতী বারোয়ারিতলায়। সভায় যোগদানের আগে তিনি সেখানকার অবাঙালি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে একান্তে আলোচনা করেন এবং বিদেশি বস্ত্র আমদানি না করার জন্য অনুরোধ করেন। সভায় তিনি হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি, বিদেশি বস্ত্র বর্জন, তিলক স্বরাজ তহবিলে অকুণ্ঠ চিত্তে অর্থদান করার আহ্বান জানায়। সিউড়ির সভায় বীরভূমবাসীর উদ্দেশ্যে যা বলেন, তার মর্মকথা হলো — 'যতদিন তোমরা তোমাদের স্বরূপ উপলব্ধি না করিয়া, দাস্যভাবের তীব্রজ্বালা অনুভব না করিবে, এই ভাব হইতে মুক্তি লাভের জন্য ব্যাকুল না হইবে, ততদিন বীরভূমকে বীরভূমই বলিব না, তোমরা মনুষ্য পদবাচ্য হইবে না।' অসহযোগ আন্দোলনে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং গ্রেফতার হয়েছিলেন তাঁদের অন্যতম হলেন জিতেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়, গোপিকাবিলাস সেন, যুগলপদ দাস, সুরেন সরকার প্রমুখ।

৪

আইন অমান্য আন্দোলন: মে মাসের প্রথম দিকে এই আন্দোলন অহিংসভাবে শুরু হলেও জুন মাস থেকে আন্দোলন সহিংস পথেও চলতে থাকে। গান্ধীজীর জয়ধ্বনি দিয়ে বিপ্লবীরাও যোগ দিয়েছিল। ট্যাক্স বন্ধ, মদের দোকানে পিকেটিং ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে আন্দোলনের (অহিংস) চরিত্র পরিবর্তিত হয়। রথযাত্রা উপলক্ষে কংগ্রেসী মিছিলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী হলে পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের সংঘর্ষ বাঁধে। আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে যাঁরা গ্রেফতার হয়েছিলেন তাঁদের অন্যতম হলো কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শরৎচন্দ্র-

মুখার্জী, শ্রমিক কংগ্রেসের সভাপতি নরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, অশ্বিনীকুমার মুখার্জী, যুগলপদ দাস, সুরেন সরকার, কামদাকিঙ্কর মুখার্জী, সৌরীন সেন, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। জেলের মধ্যেই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানসিক পরিবর্তন ঘটে। সেই সম্পর্কে দু-এক কথা বলতে হয়।

আলিপুর বোমার মামলায় গ্রেফতার হন অরবিন্দ ঘোষ। জেলের মধ্যেই তাঁর মানসিক পরিবর্তন ঘটে। মুক্তি লাভের পর তিনি রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে পণ্ডিচেরীতে যোগ সাধনায় মগ্ন হয়েছিলেন। ঠিক তেমনি বীরভূমের লাভপুর থেকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রেফতার হয়ে জেলে যান। এবং জেলের মধ্যেই তাঁর মানসিক পরিবর্তন ঘটলে তিনি মুক্তি পাওয়ার পর সাহিত্য সাধনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি বোলপুরে কাছারি পটিতে, চাটুজ্জেদের টিনের চালার ভাড়া বাড়িতে প্রেস খোলেন। নাম ছিল 'ফুল্লরা প্রেস'। তখন বীরভূমের জেলাশাসক ছিলেন গুরুসদয় দত্ত। তারাশঙ্করের অবর্তমানে ওই প্রেস থেকে একটি ব্যঙ্গাত্মক কবিতা ছাপা হয়, গুরুসদয় দত্তকে জড়িয়ে। নেপথ্যে ছিলেন কংগ্রেসী নেতা ব্যোমকেশ চট্টোপাধ্যায় (রায়পুরের) কবিতাটি খুব দ্রুত সারা বীরভূমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। সেই কবিতার কয়েকটি লাইন —

দিদির বিয়ে যেমন তেমন
দাদার বিয়ে রায়বেশে।
আয় ঢকাঢক মদ খেসে।
... ...
বীরভূম আজ বাঁধা পড়েছে
গুরুদত্তর প্রেম ডোরে।
... ...
বারণ এবার করবে না কেউ
সবাই যে ভাই জেল ঘরে।।

আপাত নিরীহ এই কবিতাটিকে কেন্দ্র করে বীরভূমে ধুন্ধুমার কাণ্ড বেঁধে যায়। প্রেস থেকে ছাপানোর দায়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে জরিমানা করা হয় এবং লেখক ব্যোমকেশকে গ্রেফতার করা হয়। যদিও প্রকাশিত কবিতায় লেখকের নাম ছিল না। পরে কংগ্রেসী নেতা সুভাষচন্দ্রের পরামর্শে জরিমানা না দিয়ে তারাশঙ্কর প্রেসটি তুলে দেন।

৫

N.S.R.A, বীরভূম ষড়যন্ত্র মামলা: বীরভূমে আন্দোলন ও তার কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে, বীরভূম কংগ্রেস দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। জগদীশ ঘোষের নেতৃত্বে 'বীরভূম জেলা যুবসমিতি' নাম দিয়ে বিপ্লবী কাজকর্ম চলতে থাকে। পরে এই দলের নাম হয় New Socialistic Republican Association (N.S.R.A) যদিও জগদীশ ঘোষ পূর্ব থেকেই খাদি ভাণ্ডারের প্রচার কার্যের অন্তরালে বিপ্লবী আন্দোলন, সংগঠনকে মজবুত করতে থাকেন। সহকর্মীদের বলতেন (লবণ) নুন তুলে কিছু হবেনা, ভায়োলেন্স করো। তখন বীরভূমে, আন্দোলনকে সক্রিয়, জোরদার করতে গড়ে ওঠে 'সাবিত্রী ক্লাব' (ভালাস গ্রাম), মল্লারপুরে 'তরুণ সংঘ', দুবরাজপুরে 'খামারবাড়ি' প্রভৃতি। বিপ্লবীরা অস্ত্র ছিনতাই, রাজনৈতিক ডাকাতি, কোষাগার লুণ্ঠন চালাতে থাকে। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে জুলাই মাস থেকে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত সুবলপুর-সহ ১২টি সফলকাম ডাকাতি, ছিনতাই, অর্থ সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। গোয়েন্দা দপ্তর বিপ্লবীদের গোপন কাজকর্ম জানতে পারে। এবং ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে ১৬ জুন ভালাস থেকে গ্রেফতার করা হয় জয়গোপাল চক্রবর্তীকে। সুবলপুর ডাকাতি মামলাকে কেন্দ্র করে জেলা পুলিশ বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি চালিয়ে ৪২ জনকে গ্রেফতার করে। শুরু হয় বীরভূম ষড়যন্ত্র মামলার প্রস্তুতি। কিন্তু ৪২ জন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জড়িয়ে কোনো মামলা দায়ের করা, আইনগত বাধা ছিল। তাই ২১ জনকে জড়িয়ে মামলা শুরু করার ইচ্ছায় ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে চিঠি দেয়। এবং ৩০৩ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ-সহ ৪০ দিন মামলা চলার পর ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের ২৪ সেপ্টেম্বর রায়দান হয়। আদালতে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদান করা হয়।

১. রজতভূষণ দত্ত – যাবজ্জীবন কারাদণ্ড
২. প্রাণগোপাল মুখার্জী – যাবজ্জীবন কারাদণ্ড
৩. সমাধীশ রায় – ১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড
৪. প্রভাতকুসুম ঘোষ – ০৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড
৫. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত – ০৬ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড
৬. ধরণীধর রায় – ওই
৭. হারানচন্দ্র খাঙ্গার – ওই
৮. উমাশঙ্কর কোনার – ওই
৯. বিজয় ঘোষ – ওই
১০. হরিপদ ব্যানার্জী – ওই
১১. সাতকড়ি চ্যাটার্জী – সাড়ে চার বছর সশ্রম কারাদণ্ড
১২. প্রদ্যোৎ রায়চৌধুরী – ওই
১৩. বিনয় চৌধুরী – ওই
১৪. কালীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী – ওই
১৫. জয়গোপাল রায় – ওই
১৬. বনবিহারী রায় – ওই
১৭. সত্যগোপাল চন্দ্র – ওই। নিত্যগোপাল ভৌমিক রাজসাক্ষী থাকায়, মুক্তি দেওয়া হয়। বিজয় চট্টরাজ, জগৎরঞ্জন দাসগুপ্ত ও দ্বারিক রায় এই অভিযোগ থেকে মুক্তি লাভ করে এবং পুনরায় ফৌজদারী সংশোধিত আইনে ধৃত হন। ১৭ জনের মধ্যে সাজাপ্রাপ্ত ১০ জনকে বিপজ্জনক বিপ্লবী হিসাবে চিহ্নিত করে আন্দামান সেলুলার জেলে পাঠানো হয়। পরে মুক্তি পাওয়ার পর অনেকেই 'আমার কুটির'এ আশ্রয় লাভ করে।

আন্দামান সেলুলার জেলে তাঁরা অন্যান্য বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসার ফলে তাঁদের মনোজগতে পরিবর্তন ঘটে যায়। তাঁরা সশস্ত্র বিপ্লবের পথ থেকে সরে এসে মার্কসীয় চিন্তাভাবনায় ভাবিত হয়ে পড়ে। এবং বীরভূম ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িত আরো অনেকে 'আমার কুটিরে' আশ্রয় নেয়। প্রতিষ্ঠাতা সুষেণ মুখার্জী তাঁদের ডাক দিয়ে বলেন 'আমার কুটির' তোমাদের সকলের কুটির। খাওয়া-পড়া, অসুখ-বিসুখ সব দায়িত্ব 'আমার কুটিরে'র। 'আমার কুটির'কে কেন্দ্র করে রূপপুর, সুরুল, দর্পশীলা, বল্লভপুর, যাদবপুর, ইসলামপুর, লোহাপুর প্রভৃতি গ্রামগুলিতে নৈশ বিদ্যালয়, চাষী, শ্রমিক সংগঠন, রাজনৈতিক সচেতনতা গড়ে ওঠে। সুরুলের অদূরে কোপাই নদীর তীরে, বল্লভপুর জঙ্গলে সূতিবস্ত্র ছাপার কারখানা গড়ে তোলেন সুষেণ মুখার্জী ১৯২৩এ (মতান্তরে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে) যা 'আমার কুটির' নামে পরিচিত। বোলপুরে খাদ্য আন্দোলন (১৯৪২, ২৯ অগস্ট) ও অন্যান্য আন্দোলনে 'আমার কুটির' উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

৬

ভারতছাড়ো আন্দোলন: লালবিহারী সিং-এর নেতৃত্বে পাইকর, জাজিগ্রাম ও ভাদিশ্বরে প্রচার কার্যের মাধ্যমে ১৩ অগস্ট ভারতছাড়ো আন্দোলনের সূচনা হয়। পরদিন বিভিন্ন স্থানে ধর্মঘট, আইনভঙ্গ হয় এবং সব বন্ধ করার আহ্বান জানানো হয়। ১৫ অগস্ট দুবরাজপুরে সভা হয়, জেলার বিভিন্ন স্থানের বহুকর্মী সমর্থক উপস্থিত হয়। রাতে গোপন সভা বসে। উক্ত সভা সম্পর্কে, দুবরাজপুর থানার নোট বুকে লিখিত – In the night (15.08.42) they held a closed door meeting at the House of Sarju Prasad Bhakat and declared the Independence of Birbhum District. পরদিন প্রকাশ্য সভা থেকে বীরভূমকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করা হয়। হেতমপুর, সিউরি, রামপুরহাট প্রভৃতি স্কুল কলেজের ছাত্ররা বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে যোগ দেয়। আন্দোলন ক্রমশ জঙ্গি আকার ধারণ করতে থাকে, কোথাও টেলিফোনের তার কেটে দেওয়া, কোথাও রেললাইনের পাত তুলে ফেলার চেষ্টা করে। বোলপুরের বিড়ি শ্রমিক, গাড়োয়ান সমিতিও আন্দোলনে সামিল

হয়। (যুদ্ধকালীন কাজে) বিমান ঘাঁটি নির্মাণের কাজে শ্রমিকরা যোগ দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। সবচেয়ে বড়ো ও সহিংস আন্দোলন হয়েছিল, বোলপুরে।

৭

বোলপুরে খাদ্য আন্দোলন — গুলি নিক্ষেপ ও মৃত্যু: বীরভূম খরা প্রবণ এলাকা। ১৯৩৪, ৩৫, ৪০ ও পরে ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে খরা; ১৯৩৬, ৩৯, ৪২ খ্রিস্টাব্দে বন্যা দেখা যায়। বাজারে তখন চাল অমিল, অগ্নিমূল্য। এক টাকায় ১৪সের চালের পরিবর্তে এক টাকায় একসের চাল। মানুষ খেতে পাচ্ছে না, হাহাকার। এই অবস্থায় হাজার হাজার মন চাল সংগ্রহ করে, সাধারণ মানুষকে অভুক্ত রেখে সরকার চাল পাচার করে দিচ্ছে। চাল পাচার বন্ধের দাবীতে ২৩ অগস্ট থেকে, বোলপুর স্টেশনে শান্তিপূর্ণ পিকেটিং হয়, ধরণীধর রায়ের নেতৃত্বে। কিন্তু সরকারের তাতে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। বসে নেই 'আমার কুটিরে'র বিপ্লবীরা। বিভিন্ন গ্রামে জনসভা করে, সংগঠিত করতে থাকে খেটে খাওয়া গরীব মানুষজনকে। ২৯.০৮.৪২ 'আমার কুটিরে'র মনোরঞ্জন দত্ত, রামপদ দত্ত, চণ্ডী সরকার প্রমুখের নেতৃত্বে হাজার হাজার মানুষ বোলপুরে সমবেত। শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রী, বিশিষ্ট জনেরাও এগিয়ে আসে। মিছিল থেকে স্লোগান — চাল-চালান বন্ধ করো, জেলার চাল জেলায় রাখো, সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক প্রভৃতি। ওয়াগন ভর্তি ও প্ল্যাটফর্মে হাজার হাজার মন চাল। জনতা ওয়াগন থেকে টেনে চাল নামাতে চেষ্টা করে, স্টেশনের আসবাব ভাঙচুর করতে থাকার সময় ট্রেন ভর্তি পুলিশ এসে হাজির এবং জনতার উদ্দেশ্যে পাথর, গুলি চালাতে থাকে। গুলিতে লুটিয়ে পড়ে বোলপুরের যুবক তারাপদ গুঁই। মহিষঢালের জটা মাঝিও গুলিবদ্ধ হয়ে মারা যায় পরে। আহত হয় প্রচুর। ঘটনাকে কেন্দ্র করে 'Bolpur Station Looting' কেস দেওয়া হয়। আদায় করা হয় পিটুনি কর। ঘটনায় যাঁরা গ্রেফতার হন তাঁদের অন্যতম ধূজটিপ্রসাদ চক্রবর্তী, নিশাপতি মাঝি, ব্যোমকেশ চট্টোপাধ্যায়, বালেশ্বর ভকত, রামপদ দত্ত প্রমুখ।

৮

পঞ্চাশের মন্বন্তর — মৃত্যু: বাংলা ১৩৫০ (ইংরেজি ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ) ইতিহাসে পঞ্চাশের মন্বন্তর নামে খ্যাত। খাবারের অভাবে গরু, ভেড়া, কুকুরের মতো মানুষ মারা যাচ্ছে। সরকারের তেমন হেলদোল নেই। সরকারি উদ্যোগে লঙ্গারখানার সংখ্যা নগণ্য। স্থানে স্থানে বেসরকারি উদ্যোগে লঙ্গারখানা, তারও সংখ্যা খুব একটা বেশি নয়। শুরু হলো রেশন দেওয়া। দুঃখ, দুর্দশা দূর করতে জোতদারদের গোলা ভেঙে ধান দেওয়া হলো গরীব মানুষদের। সেই সমস্ত নেতাদের সরকার গ্রেফতার করলেন। মন্বন্তরের পরের বছর পর্যাপ্ত ধান। আগের বছর মানুষ না খেতে পেয়ে মরেছে অনেক। এতদিন যারা আধপেটা খেয়ে, অনাহারে থেকেছে, এখন অতিরিক্ত খাওয়ার ফলে পেটের অসুখে মারা যাচ্ছে। এগিয়ে এলেন নেতারা, বোঝালেন। সরকার যাতে ধান সংগ্রহ করতে না পারে সেজন্য গ্রামে গ্রামে কমিটি গড়ে উঠল। আওয়াজ উঠল 'জান দেব, তবু ধান দেবনা'। 'যুদ্ধে এক পাইও (টাকা পয়সা) না এক ভাইও না'। মানুষ সংঘবদ্ধ হলো, জোট বাঁধল। অবশেষে এলো সেই দিন। ভারত হলো স্বাধীন।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ অগস্ট বীরভূমের বিভিন্ন স্থানে সকাল থেকেই জাতীয় পতাকা হাতে দলে দলে মানুষজন, মুক্তির নিঃশ্বাস। বোলপুর গার্লস হাইস্কুলের ছোটো পণ্ডিত ধ্বজাধারী মুখোপাধ্যায় উচ্চস্বরে গীতা পাঠ করছেন, ডাঙালী কালীতলায় পথে হাঁটছেন সর্বস্তরের মানুষ। বিভিন্ন পাড়া থেকে প্রভাতফেরি এসে মিলিত হলো বোলপুর হাইস্কুলে। প্রভাতফেরিকে অভিবাদন করছেন, সুভাষচন্দ্রের গলায় মালা দেয় সেদিনের কিশোরী, বর্তমানে বিবাহিতা আশালতা কুণ্ডু।

অজানা / অচেনা বীরভূমের স্বাধীনতা সংগ্রামী

১

আশালতা কুণ্ডু: আনুমানিক ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে বোলপুরে জন্ম। পিতা শিবপদ কুণ্ডু। বাড়িতে স্বদেশি হাওয়া। তাঁদের গুদাম ঘরে রাতে খাবার ঢাকা দেওয়া থাকতো। গোপনে পুলিশের নজর এড়িয়ে বিপ্লবীরা আসে, খাবা

তাদের জন্যই। রাতে ওখানেই থেকে ভোর হওয়ার আগেই চলে যায়। দাদা পশুপতি বেশ কয়েকবার জেল খেটেছেন। এবং হিজলি জেলে পুলিশের প্রহারের ফলে সারাজীবনের জন্য বধির হয়ে পড়েন। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে সুভাষচন্দ্র বোলপুর কালীবারোয়াড়ী তলায় সভা করেন। আশালতা সুভাষের গলায় মালা দিয়ে বরণ করেন। মালা দেওয়ার জন্য বোলপুর থানার দারোগা, তাঁর বাবাকে খুব ধমক দেন। ভবিষ্যতে এই ধরনের কাজ থেকে দূরে থাকতে বলেন। আশালতা খরা, বন্যার ত্রাণে নেতাদের সঙ্গে বোলপুরে ঘুরে ঘুরে অর্থ সংগ্রহ করেছেন। তাঁর বিয়ে হয় বাংলাদেশে সন্তোষ কুণ্ডুর সঙ্গে। তিনি নিজে যেমন ভারতের স্বাধীনতার জন্য লড়েছেন, তেমনি পুত্ররাও লড়েছেন বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে। পুত্র বিমলকে পাক সেনারা মারতে মারতে নিয়ে যায়। বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও বিমল ফেরেনি। আশালতা বুকফাটা যন্ত্রণা নিয়ে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত অপেক্ষায় থেকেছেন। তবে স্বামীর ভিটে ত্যাগ করে ভারতে আসেননি। কারণ ছেলে ফিরে এসে যদি মায়ের খোঁজ করে। ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে পাঁচবিবি, জয়পুরহাট, বাংলাদেশে আশালতা মারা যান।

২

সত্যবালা চট্টোপাধ্যায়: বাঁকুড়া জেলার বামসাগর গ্রামে জন্ম ১৩০৪ বঙ্গাব্দে (ইংরেজি ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দ)। পিতা অযোধ্যানাথ মুখোপাধ্যায়। বীরভূমের মল্লারপুরে বিয়ে হয়, কীর্তিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তখন তাঁর বয়স দশবছর। পাশাপাশি গরীব মানুষজনদের বাস। জমিদার ভগবানচন্দ্র দাসের অত্যাচারে অতিষ্ঠ মানুষজন। নারীর সম্মান রক্ষা করাও কঠিন। কলিম খাঁর যুবতী স্ত্রী হাসিনাকে ঘর থেকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল জমিদারের লোকজন। রণরঙ্গিনী মূর্তিতে প্রতিরোধ করেন সত্যবালা। তাঁর ওই মূর্তি দেখে চম্পট দেয় জমিদারের লোকজন। স্বাধীনতা দিবস পালন (১৯৩০) উপলক্ষে আশে-পাশের মেয়েদের সংগঠিত করে, ধামসা-মাদলের তালে তালে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিতে দিতে চলেছেন সিউড়ি, পায়ে হেঁটে। সিউড়ি সার্কিট হাউসে পৌঁছাতে পথ আগলে দাঁড়ালেন দারোগা। কথা কাটাকাটি হতেই দারোগা সপাটে চড় কষিয়ে দিলেন তাঁর গালে। তবুও রোধ করা গেলোনা সত্যবালাকে। স্বয়ং এস.পি তাঁর ওই মূর্তি দেখে স্তম্ভিত হয়ে থানায় যাওয়ার অনুমতি দিলেন। চপেটাঘাতের দাগ তখনো মিলিয়ে যায়নি, প্রতিজ্ঞা করলেন, শপথ নিলেন সহিংস আন্দোলনের। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে দুবরাজপুরের কৃষক সম্মেলনে তিনি ছিলেন একমাত্র মহিলা বক্তা। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে মল্লারপুরে কৃষক সম্মেলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। নারীদের সম্ভ্রম, আত্মরক্ষা, স্বনির্ভর করতে গড়ে তোলেন আত্মরক্ষা সমিতি। মন্বন্তরে খাবার না পেয়ে যখন মানুষ মারা যাচ্ছে, সেই সময় মল্লারপুরে সার্কেল অফিসারকে আটক রেখে, বাধ্য করেছিলেন চাল, কাপড়, কেরোসিন তেল দিতে। দেশ স্বাধীন হলেও স্বাধীনতা সংগ্রামীর পেনশন নেননি। যে কম্যুনিস্ট দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন মতভেদের কারণে দল থেকে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি মারা যান।

৩

দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়: পিতা কালীপদ, মা স্বর্ণলতা, ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে জন্ম। পিতৃভূমি শান্তিনিকেতনের অদূরে গোয়ালপাড়ার পাশে কোহালাই। তালতোড়ের জমিদারদের মিথ্যে মামলায় নাজেহাল, সর্বস্বান্ত হয়ে মারা যান ঠাকুরদা মহেন্দ্রলাল এবং পিতা কালীপদ। বাধ্য হয়ে গ্রাম ত্যাগ করে মুর্শিদাবাদের ইন্দ্রানীতে গিয়ে পাঠশালায় পাঠ শুরু করেন। স্কুলে পড়তে পড়তে পিকেটিং, মিছিল, মিটিং-এর মাধ্যমে কংগ্রেসী আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু কংগ্রেসের নিস্পৃহ আন্দোলনে আস্থা হারিয়ে বিপ্লবী দলে যোগদান করেন। ইতিমধ্যে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বিভাগে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তিনি দলের কাজে গিয়ে চুঁচুড়ায় গ্রেফতার। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে, পুলিশ কমিশনার হত্যার অপরাধে মুক্তি পেয়ে মুলুক, বোলপুরে বসবাস। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ফরোয়ার্ড ব্লকের দিল্লি অধিবেশনে বীরভূম থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন। মুলুক নিম্ন বুনিয়াদী স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা, ওই স্কুল থেকেই ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে অবসর, প্রধান শিক্ষক হিসাবে। শিক্ষকদের সংগঠিত করতে গিয়ে একাধিকবার কারাবরণ করেন। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে প্রেসিডেন্সি জেলে আটক হন শিক্ষক আন্দোলন গঠন করতে গিয়ে। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দের ৭ জুলাই মৃত্যু হয়। বীরভূম-সহ অন্যান্য জেলায় তাঁর বহু লেখা প্রকাশিত —

কখনো স্বনামে কখনো অগুরু গুপ্ত কখনো বা হলধর মালিক ছদ্মনামে।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. অমিয় ঘোষ, 'জাতীয় আন্দোলন ও জেলা বীরভূম'
২. আনন্দ সেন, 'শতবর্ষে আমার কুটির (১৯২৩-২০২৩)'
৩. দেবব্রত ঘোষ, 'মহাত্মাগান্ধী ও ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন'
৪. শ্রীদুর্গা ব্যানার্জী, 'স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের সংগ্রামে বীরভূম'
৫. রঞ্জন গুপ্ত, 'রাঢ়ের সমাজ অর্থনীতি ও গণবিদ্রোহ'
৬. প্রতিবেদন, 'ভারতছাড়ো আন্দোলন' ১৯৪২, শহীদ স্মারক কমিটি, বোলপুর, বীরভূম

লেখক পরিচিতি: সৌরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শিক্ষক, ইতিহাস বিভাগ, ইলামবাজার হাইস্কুল, বীরভূম।